দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/RI24008

# মার্কসবাদী সাহিত্যনির্মাণসূত্র : আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও যতীন সরকার-এর নিরিখ

# (Marxist literary Creation Theory: Views of Ahmed Sharif, Serajul Islam Choudhury and Jatin Sarker)

**মোঃ রবিউল ইসলাম***

## সারসংক্ষেপ

মার্কসবাদে সাহিত্যসৃষ্টি একটি তাত্ত্বিক শিল্পকর্ম। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের জনক কার্ল মার্কস ও সহকর্মী এঙ্গেলস এবং অন্যান্য তাত্ত্বিকগণ সাহিত্যনির্মাণতাত্ত্বিক অভিমত ব্যক্ত করেন। সমাজবাদী প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও যতীন সরকার মার্কসবাদী সাহিত্যসৃষ্টির উপায়, সাহিত্যের উপকরণ, বিষয়-আঙ্গিক, উদ্দেশ্য-আদর্শ, দায়-দায়িত্ব, জীবনাদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐতিহাসিক আধেয় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁদের মার্কসীয় সাহিত্যনির্মাণতাত্ত্বিক ধারণাকে বিশ্লেষণ ও যাচাই করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। প্রাবন্ধিকত্রয় পরস্পর মার্কসবাদের পুরোধা ও সাহিত্যনির্মাণতাত্ত্বিকদের সঙ্গে একমত যে সাহিত্য জীবনসম্পৃক্ত; বাস্তবতা এর অবলম্বন এবং বিষয়-আঙ্গিক পরস্পর জড়িত। সাহিত্য রচনার উপাদান, উপকরণ ও শৈলীর উৎস গণমানুষ। সমাজ ও সাহিত্যের ওপর পারস্পরিক প্রভাব বিদ্যমান। সাহিত্যিকের সামাজিক দায় থেকে সামাজিক পরিবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে সাহিত্যরচনা করা বাঞ্ছিত। সাহিত্যিক সমাজের ক্ষতকে চিহ্নিত করে ক্ষত নিরাময়ের উপায়রূপে পথ ও পদ্ধতি বাৎলে গণমানুষকে বিপ্লব বা পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করবেন। সাহিত্যের শ্রেণিচেতনা, সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ না উপযোগ বা দ্বিবিধ, শিল্পীর স্বাধীনতাসহ কয়েকটি প্রসঙ্গে তাঁরা তাত্ত্বিকদের সঙ্গে এবং পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করেন।

[**Abstract:** Literary creation in Marxism is a theoretical art. Karl Marx, the father of Marxist literary theory, and Friedrich Engels, his

* সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ও পিএইচ ডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল rabiuldu0281@gmail.com

colleague, along with other theorists expressed the view of literary constructionism. Socialist essayists Ahmed Sharif, Serajul Islam Choudhury and Jatin Sarker expressed their opinions on Marxist literary building techniques, materials, themes, objectives, responsibilities, and the philosophy of life. This article aims to analize and verify their Marxist literary constructionist ideas by adopting a historical content analytical method. The three essayists agree with the forerunners of Marxism and literary constructionists that literature is connected to life; its basis in reality, and its matter and form are interrelated. The source of the elements, materials, and style of literary writing is the mass people. There is a mutual influence on society and literature. It is desirable that the writers, out of their social responsibility, should write literature for the ultimate goal of bringing social change.The writer should identify the wounds of society and show the masses the ways and means to heal them, leading them on the path of revolution or change.They disagreed with theorists and with each other on several topics, including the class consciousness of literature, whether the goal of literature is pleasure or utility or both, and the freedom of the artist].

## ভূমিকা

সাহিত্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এটি পৃথিবীর প্রাচীন শিল্পগুলোর অন্যতম। সাহিত্য ভাষাশিল্প। আহমদ শরীফের মতে, মানবানুভূতি-সঞ্জাত যে ভাব মানুষের মন ও মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা-ই সাহিত্যে বাণীরূপ লাভ করে। সাহিত্যে সুন্দর শব্দে ও সুশোভিত বাক্যে মানুষের ভাব ও অনুভূতির সযত্ন প্রকাশ ঘটে (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৪১)। বস্তুত যথাযথভাবে বক্তব্য বিন্যস্ত ও ব্যক্ত হলে ভাব-অনুভূতি সহজবোধ্য এবং বাক্য আকর্ষণীয় ও লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। এরূপ বক্তব্য ও বাক্যবিন্যাসের সমন্বিত রূপে লিখিত বাকশিল্পের নামই সাহিত্য (শরীফ, ২০০৬, পৃ. ৩৯৭)। লোকরঞ্জন বা মানবকল্যাণের অভিপ্রায়ে এর সৃষ্টি। সাহিত্য ব্যক্তি ও জাতির মানস-ফসল (শরীফ, ২০১০, পৃ. ১১৫)। কাজী আবদুল ওদুদ মনে করেন, "সাহিত্য জীবনবৃক্ষের ফুল, জাতি বা সমাজ বিশেষের মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে" (ওদুদ, ২০১৯, পৃ. ৩৬)। সাহিত্য বায়বীয় কল্পনা নয়; এটা মানবসৃষ্ট এবং মানবসংশ্লিষ্ট। লেখকের মননধর্মী কল্পনা, সামাজিক বাস্তবতা বা বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এর উদ্দেশ্য, আদর্শ, শৈলী, পথ, পদ্ধতি প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাহিত্যের প্রকৃত আদল-আদর্শ-শৈলী কী হওয়া উচিত — এসব নিয়ে বুর্জোয়া ও সমাজবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের তিনজন সমাজবাদী প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

(১৯৩৬), যতীন সরকার (১৯৩৬) এসম্পর্কে তাঁদের প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত সাহিত্যের নির্মাণতাত্ত্বিক মার্কসবাদী ভাবনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের অভিপ্রায়ে লিখিত এই প্রবন্ধ।

**মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ও সাধারণ সূত্রাবলি**

বিশ শতকে সাহিত্যজগতে একটি নতুন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। সাহিত্য সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) মত-মন্তব্য থেকে এই ধারণার সূত্রপাত। ১৮৪৪ সালে মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) একটি সাক্ষাৎকারে সাহিত্যশিল্প সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। এরপর তাঁরা *The German Idcology* (1846) গ্রন্থে সাহিত্যশিল্প সম্পর্কিত দর্শন প্রকাশ করেন। এখানে মার্কস সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গে বলেন,

> Morality, religion, metaphysics, and all the rest of ideology as well as the forms of consciousness corresponding to these, thus no longer retain the semblance of independence. They have no history, no development; but men, developing their material production and their material inter course, alter, along with this their actual world, also their thinking and the products of their thinking (Marx-Eagels, 1976, p. 42).

এরপর বিভিন্ন রচনায় মার্কস সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসমালোচনার কিছু তত্ত্ব ও সূত্র প্রদান করেন। এঙ্গেলস মার্কস প্রদত্ত সেই তত্ত্ব ও সূত্রকে ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের শক্ত ভিত নির্মাণ করেন। ইটালির মার্কসবাদী অধ্যাপক এন্টোনিও ল্যাব্রিয়লা (১৮৪৩-১৯০৪) ও রাশিয়ান মার্কসবাদী দার্শনিক জর্জি ভ্যালেন্তিনোভিচ্ প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) মার্কস ও এঙ্গেলসের সাহিত্য-বিষয়ক মন্তব্যগুলোকে একটি সুসংঘবদ্ধ রূপ দেন। পরবর্তীকালে মার্কস ও এঙ্গেলসের সাহিত্য বিষয়ক অভিমতসমূহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিবেদন গড়ে ওঠে। মার্কসের অনুসারীগণ এই পথকে প্রশস্ত ও মসৃণ করেন। প্লেখানভ মার্কসীয় অভিমত নিয়ে আলোচনার শুরু করেন। এরপর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) মার্কসবাদী সাহিত্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। রাশিয়ার প্লেখানভ, লেনিন, আনাতলি লুনাচার্সকি (১৮৭৫-১৯৩৩), লিওন ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০), চীনের লু-সুন (১৮৮১-১৯৩৬), হাঙ্গেরির গেয়র্গ লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১), চীনের মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬), ফ্রান্সের লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২), অস্ট্রিয়ার আর্নস্ট ফিশার (১৮৯৯-১৯৭২) যুক্তরাজ্যের জর্জ থমসন (১৯০৩-১৯৮৭) এবং ইংল্যান্ডের ক্রিস্টোফার কডওয়েল (১৯০৭-১৯৩৭) — এই এগারো জন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক-লেখক মার্কসবাদী সাহিত্যের ‘স্কুল অব থট’ গড়ে তোলেন (আকাশ, ২০০৬, পৃ. ১৪৪)।

১৯১৭ সালে লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধানরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মার্কসবাদী সাহিত্যের রূপরেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ম্যাক্সিম গোর্কিকে (১৮৬৮-১৯৩৬) মার্কসবাদী সাহিত্যের ইশতাহার তৈরির দায়িত্ব দেন। ম্যাক্সিম গোর্কি ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সোভিয়েত লেখক সংঘ (সংগঠন) কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে মার্কসবাদের ইশতাহার প্রণয়ন করেন (ভট্টাচার্য, ২০০৭ : ১৭৮)। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ায় মাও সে তুং সাহিত্যশিল্প বিষয়ে বিখ্যাত 'ইয়েনান ভাষণ' দেন। এখানে তিনি বিদ্যমান অবস্থা ফুটিয়ে তোলার উপর জোর দিয়ে তত্ত্বগতভাবে 'শতফুল ফুটতে দাও' বলে সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তাকে প্রসারিত করার আহ্বান জানান (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫৯-০, ১৬২)। ১৯৪৬ সালের ১৪ আগস্ট আন্দ্রেই আলেক্সান্দ্রোভিচ ঝানভ (১৮৯৬-১৯৪৮) লেনিনগ্রাদে রুশ লেখকদের সম্মেলনে মার্কসবাদী সাহিত্যের শোক-তাপ-দুঃখহীন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেন এবং লেখকদের তা অনুসরণের 'ফতোয়া' জারি করেন (সরকার, ২০১৮, পৃ. ২৬১, ২৬২)। ১৯৫৬ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে চীনে একটি সাংস্কৃতিক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এখানে দেশি-বিদেশি অতীত সাহিত্যসংস্কৃতির মূল্যবান অংশ আত্তীকরণ করে চীনে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৬১-৪)। চীনে লু-সুন (১৮৮১-১৯৩৬) এবং চো ইয়াঙ (১৯০৮-১৯৮৯) মার্কসবাদী সাহিত্যের বাস্তবতা ব্যাখ্যার অস্পষ্টতা দূর করে মার্কসবাদী সাহিত্যদর্শনের প্রসার ঘটান। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২২তম কংগ্রেসে "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা" নিয়ে রক্ষণশীল ও উদারপন্থী সাহিত্যিকগণ স্ব স্ব দলীয় ব্যাখ্যা হাজির করেন (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৬২, ৬৭)। এছাড়া বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ মার্কসবাদী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। এভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের সাহিত্য বিষয়ক অনুজ্ঞাবলি, লেনিন ও ম্যাক্সিম গোর্কির আদেশাবলি, অন্যান্য মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ ও মার্কসঅনুসারীগণের ধারণাসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের কংগ্রেস ও সমাজতান্ত্রিক চীনের সরকারি সিদ্ধান্ত থেকে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের (সাহিত্যনির্মাণতত্ত্ব ও সাহিত্যসমালোচনাতত্ত্ব) মোটামুটি একটি আদর্শ রূপরেখা পাওয়া যায়। এর সঙ্গে বাংলাদেশের আলোচ্য তিনজন প্রাবন্ধিকের মার্কসবাদী সাহিত্যনির্মাণ, মার্কসীয় সাহিত্যবিচার এবং বাংলা সাহিত্যসমালোচনা সম্পর্কিত মত-মন্তব্য মিলিয়ে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নিম্নোক্ত সাধারণ সূত্রাবলি পাওয়া যায়—

১. সাহিত্য উপযোগবাদী শিল্প-শিক্ষা এবং মানবকল্যাণই এর অভীষ্ট লক্ষ্য।
২. সাহিত্যে বিষয়ই প্রধান, আঙ্গিক বিষয়নির্ভর।
৩. গণমানুষের ভাষাই সাহিত্যের নির্মাণ-উপকরণ; কিন্তু তা পরিমিতিবোধসম্পন্ন অলঙ্কারশোভিত।

৪. সাহিত্য ও জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; বাস্তবজীবন, সামাজিক অনুষঙ্গ এবং পরিপ্রেক্ষিত এর আশ্রয়।
৫. সাহিত্য সামাজিক ও মানসিক সমস্যার চিত্রণ এবং এর ভূমিকা সমস্যা সমাধানমূলক ও ক্ষতনিরাময়মূলক।
৬. সাহিত্য মানবমনে আশাবাদ ও সদর্থক জীবনবোধের জন্ম দেয়।
৭. সাম্য, ন্যায়বিচার, সামষ্টিক স্বার্থ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার অধীনে সাহিত্যিক স্বাধীন। এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়।
৮. সাহিত্য সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিনির্মূলে কাজ করে এবং সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে।
৯. সাহিত্য একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ধারণ ও লালন করে।
১০. প্রত্যেক লেখকের রচনাশৈলী এবং স্বকীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়।
১১. পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ এক অখণ্ড মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা সাহিত্যের অভিপ্রায়।
১২. মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর অনুকূল পরিবেশ রচনার পক্ষে সাহিত্য সক্রিয়।
১৩. সাহিত্যনির্মাণ, সাহিত্যবিচার, সাহিত্যপাঠের জন্য রসবোধ ও উপভোগের রুচি আবশ্যক।
১৪. সাহিত্য রচনার ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমি আমলযোগ্য।
১৫. সাহিত্যকে প্রথমত শিল্প হিসেবে বিচার্য। এরপর অন্যান্য বিষয় বিবেচ্য।
১৬. সাহিত্যসমালোচনা একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক কর্মকাণ্ড।
১৭. সমালোচক সাহিত্যিকের সমাজবীক্ষণ ও শৈল্পিক দুর্বলতার চিহ্নিতকারী।
১৮. সাহিত্য সমাজবাদী রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের উপায় এবং উপকরণ।

## মার্কসবাদী বাংলা সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যসমালোচনা

মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব একটি বহুল আলোচিত-সমালোচিত ডিসকোর্স। মার্কসবাদী সাহিত্যদর্শন সৃষ্টি লগ্ন থেকে ক্রমশ জার্মান, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি তথা সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর এই তত্ত্ব বাঙালি লেখক-তাত্ত্বিকদের নাড়া দেয়। এর ফলে এদেশের সাহিত্যে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও মার্কস অনুসারীগণ বাংলা সাহিত্য রচনায় ও সাহিত্যবিচারে এই নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটান। মার্কস-প অনুসারী সাহিত্যিকদের সৃজনশীল রচনায় মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রতিফলন ও চেতনা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে প্রবন্ধসাহিত্যে একদল মার্কসঅনুসারী মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং অন্যদল মার্কসবাদী চিন্তার অনুসরণে সাহিত্য বিশ্লেষণ শুরু করেন

(দাশ, ১৯৭৬, পৃ. ভূমিকা এক)। এক্ষেত্রে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) ও অধ্যাপক বিনয় সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা দু'জন প্রবাসে থাকতে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯২৪) করে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সাল থেকে তিনি *দেশ* ও *আনন্দবাজার* পত্রিকায় মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচার আরম্ভ করেন। একই সময় অধ্যাপক সুশোভন সরকারও (১৯০০-১৯৮২) মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন (দাশ, ১৯৭৫, পৃ. ভূমিকা ছয়, নয়)। ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় অধ্যাপক সুশোভন সরকার "রুষ বিপ্লবের পটভূমি", "রুষ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এসময় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), "অর্থ কাব্য-জিজ্ঞাসা" এবং রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি*'র সঙ্গে বিদেশি তিনটি গ্রন্থের তুলনা করে সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন। "অর্থ কাব্য-জিজ্ঞাসা" প্রবন্ধটি মার্কসবাদের সূত্রগুলোর ব্যাখ্যায় সমসাময়িক সময়ে নতুন বার্তা দেয়। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) "সাহিত্যে বাস্তববোধ" প্রবন্ধ *পরিচয়* পত্রিকার প্রকাশিত হয় (দাশ, ১৯৭৫, পৃ. ভূমিকা সাত, আট, নয়)।

১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে গৃহীত 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র সাহিত্যাদর্শের অনুজ্ঞাবলি, ইউরোপের 'নিউ রাইটিং' আন্দোলন, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ক্রিস্টোফার কডওয়েলের বিখ্যাত গ্রন্থ *Illusion and Reality/Stydies in Dying a Coulture*, র‍্যালফ ফক্সের রচনাবলি প্রভৃতি বাঙালি মার্কসবাদী সাহিত্যিক-সমালোচকগণ পাঠ করেন। তাঁরা এসব রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন (দাশ, ১৯৭৫, পৃ. ভূমিকা তেইশ, চব্বিশ)। এই প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ভূমিকা এবং ইউরোপ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনকারী সজ্জাদ জহীর (১৯০৫-১৯৭৩), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৭-২০০৪) প্রমুখ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখকের সচেতন প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল মুনশী প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬)-এর সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়। এর সম্পাদক সজ্জাদ জহীরের প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই কলকাতার এলবার্ট হলে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়। এই সংগঠনটি মার্কসবাদী চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত *ট্যুওয়ার্ডস প্রোগ্রেসিভ লিটারেচার* এবং *প্রগতি* নামক সংকলনে প্রগতি লেখকগোষ্ঠীর রচনা প্রকাশিত হয়। এই সংগঠনটি তরুণদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), অচ্যুত গোস্বামী (১৯১৮-১৯৮০), কিশোর সোমেনচন্দ (১৯২০-১৯৪২) প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা ঢাকায় স্থাপিত হয়। কলকাতার পরেই ঢাকা সবচেয়ে সক্রিয় কেন্দ্র হয়ে ওঠে (দাশ, ১৯৭৫, পৃ. ভূমিকা নয়, দশ, এগার, পনের, আঠারো, উনিশ)।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রফুল্ল রায় সম্পাদিত *অগ্রণী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *অগ্রণী*র বিভিন্ন সংখ্যায় সুধী প্রধান (১৯১১-১৯৯৭), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) প্রমুখ রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। এঁদের মধ্যে সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কসবাদী কাব্যচর্চা করেন। ১৯৩৯-৪০ সালে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এসকল অঞ্চলে কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল সাহিত্যসংস্কৃতিচর্চায় উদ্বুদ্ধ হন। এঁরা *প্রতিরোধ*, *নবযুগ*, *বলাকা*, *প্রগতি* প্রভৃতি সাময়িকীর মাধ্যমে মার্কসীয় চিন্তাচর্চা ও সাহিত্যসমালোচনা আরম্ভ করেন (দাশ, ১৯৭৫, পৃ. ভূমিকা তেইশ, চুরানব্বই, ছিয়ানব্বই)। ১৯৪১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *অরণী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় মাধ্যমে সুকান্ত ভট্টাচার্য আত্মপ্রকাশ করেন। এর পাতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অক্টোবরের বিপ্লব ও লেনিন বিষয়ক কবিতা, "লেনিনের দৃষ্টিতে আর্ট– আর্ট ও জনমানব", সুধী প্রধানের "বাংলা সাহিত্য ও মার্কসবাদ" প্রভৃতি রচনা স্থান পায় (দাশ, ১৯৭৫, পৃ. ভূমিকা ত্রিশ, বত্রিশ)। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে (শ্রাবণ মাসে) গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) "ঔপনিবেশিক সমাজ ও উপন্যাস" প্রবন্ধ *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (দাশ, ১৯৭৫, পৃ. ভূমিকা সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশ)। *ডাক*, *পরিচয়*, *নতুন সাহিত্য*, *ইস্পাত* প্রভৃতি পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) মার্কসবাদী প্রবন্ধ লেখেন। তিনি প্রধানত মার্কসবাদী কথাসাহিত্য রচনা করেন। ১৯৪০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *ক্রান্তি* নামক প্রগতিশীল সাহিত্য সংকলন। এই সংকলনে রণেশ দাশগুপ্ত "নতুন দৃষ্টিতে উপন্যাস পর্যালোচনা" প্রবন্ধ স্থান পায় (আহসান, ২০১৯, পৃ. ১০-১, ২৮)।

১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হয়। এর ফলে সব কিছুর মতো বাংলা সাহিত্যও পূর্ব ও পশ্চিম — দুই ধারায় বিভক্ত হয়। এপর্যায়ে পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্তমান সীমানায় রচিত সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনার প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসপ্রবণতা বিচারে একটি গতানুগতিক ধারা ও অন্যটি প্রগতিশীল ধারা। গতানুগতিক ধারার লেখকগণ পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস ও জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করে সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ সনাতনী ধারায় সাহিত্যসমালোচনা করেন। প্রগতিশীল ধারার সাহিত্যিকগণ অসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন (আলী, ২০১২, পৃ. ১১-৩) এবং সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ প্রথাবিরোধী প্রগতিশীল সাহিত্যসমালোচনা করেন। তাঁরা সাহিত্যে আধুনিক, জগৎমুখী, মানবমঙ্গলকামী চেতনার স্বাক্ষর রাখেন (আহসান, ২০১৯, পৃ. ২৩)। প্রগতিশীলদের একটা অংশ মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। মার্কসবাদীদের রচিত সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক, গণমুখী সমাজবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশে রণেশ দাশগুপ্ত এধারার পথিকৃৎ। এছাড়া

আহমদ শরীফ, মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪), বদরুদ্দীন উমর (১৯২৯), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যতীন সরকার, আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪) প্রমুখ এই ধারার অন্যতম প্রতিনিধি। বাংলাদেশের প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদী চিন্তা সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি চল্লিশের দশকের যান্ত্রিক মার্কসবাদী দৃষ্টি অতিক্রম করে সমাজবাস্তবতা এবং শ্রমজীবী মানুষের চেতনাকে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। তিনি সাহিত্যসাধনায় মার্কসবাদী ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। রণেশ দাশগুপ্তের *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (১৯৫৯), *শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে* (১৯৬৬) উল্লেখযোগ্য সমালোচনাপ্রবন্ধ গ্রন্থ।

আহমদ শরীফ বামঘরানার প্রগতিশীল, মুক্তচিন্তক, মানবতাবাদী প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। *বিচিত্র চিন্তা* (১৯৬৮), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯), *জীবনে, সাহিত্যে, সমাজে* (১৯৭০) তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থ। বাংলাদেশের প্রবন্ধে মুনীর চৌধুরী বামপন্থী গবেষক প্রাবন্ধিক। সাহিত্য ও ভাষা তাঁর প্রবন্ধ রচনার প্রধান অনুষঙ্গ। মুনীর চৌধুরী *মীর মানস* (১৯৬৫), *তুলনামূলক সমালোচনা* (১৯৬৯), *বাংলা গদ্যরীতি* (১৯৭০) প্রভৃতি প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন। সরদার ফজলুল করিম মার্কসবাদী রাজনীতিসচেতন প্রাবন্ধিক। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, আমাদের সাহিত্য, নূহের কিশতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ* তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। বদরুদ্দীন উমর বামপন্থী রাজনীতিমনস্ক প্রাবন্ধিক। *সাম্প্রদায়িকতা* (১৯৬৬), *সংস্কৃতির সংকট* (১৯৬৭), *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (তিন খণ্ড, ১৯৭০, ১৯৭৬, ১৯৮১) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মার্কসবাদী প্রগতিশীল ধারার প্রাবন্ধিক। তিনি প্রবন্ধ রচনায় এবং সাহিত্যসমালোচনায় উদার মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং যুক্তিবাদী। তিনি *দ্বিতীয় ভুবন* (১৯৭৪), *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ* (১৯৮৩), *বাঙালী কাকে বলি* (১৯৮৮)সহ প্রায় শতাধিক মার্কসীয় চেতনাশ্রয়ী প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানেও তিনি প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। যতীন সরকার সমাজবাদী প্রবন্ধকার ও সমালোচক। তিনি রাজনীতি, সমাজ, সাম্প্রদায়িকতা, সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ *পাকিস্তানের ভূতদর্শন* (২০১৩), *সাঁকো বাঁধার প্রত্যয়* (২০১৬), *মুক্তবুদ্ধির চড়াই-উৎরাই* (২০১৮), *প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা প্রতিভা* (২০১৯)। প্রবন্ধ রচনায় এবং সাহিত্যবিচার-বিশ্লেষণে তিনি মার্কসবাদআশ্রয়ী (সরকার, ২০১৪, পৃ. ১২৬)। আহমদ ছফা সমাজ ও রাজনীতির সূক্ষ্মদর্শী ও বিশ্লেষণধর্মী প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্যিক। *জাগ্রত বাংলাদেশ* (১৯৭১), *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৭২), *বাঙালি মুসলমানের মন* (১৯৮১) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থ। এছাড়া কাব্যগ্রন্থ *জল্লাদ সময়* (১৯৭৫), *লেনিন*

*ঘুমোবে এবার* (১৯৯৯), উপন্যাস *ওঙ্কার* (১৯৭৫), *অলাতচক্র* (১৯৯৪) প্রভৃতি তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম। তিনি বাংলাদেশের বামঘরানার বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। আবুল কাসেম ফজলুল হক বামপন্থী সমাজ-রাজনীতিসচেতন প্রাবন্ধিক। *মুক্তিসংগ্রাম* (১৯৭২), *উনিশ শতকের মধ্যবিত্তশ্রেণি ও বাঙলা সাহিত্য* (১৯৭৯), *বাঙলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা* (১৯৯৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। বাংলাদেশের বামপন্থী সৃজনশীল লেখকদের মধ্যে কবি মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩-২০২৩) উল্লেখযোগ্য। *কীর্তিনাশা* (১৯৭৯), *কালাপানি* (২০০৬), *নোনাঝাউ* (২০০৮) প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ।

## আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও যতীন সরকারের মার্কসবাদী হওয়ার প্রেক্ষাপট

আহমদ শরীফ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)-এর পরিবারে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। এখানে তিনি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে "ভাষা বিভ্রাট" শিরোনামে নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আহমদ শরীফ প্রথমে সৃজনশীল সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। পরে সাহিত্য রচনায় নিজের সৃজনশীল ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা অনুধাবন করে প্রবন্ধ ও গবেষণা-প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগী হন। তাঁর রচিত প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধগুলো ১৯৬৮ সালে *বিচিত্র চিন্তা* নামে প্রকাশিত হয়। আহমদ শরীফ সরাসরি রাজনীতি করেননি। তবে বিবেকের তাড়না ও কর্তব্যবোধে প্রবন্ধে তিনি রাজনৈতিক চিন্তা ব্যক্ত করেন। সাম্য, ন্যায়বোধ ও কল্যাণচেতনা থেকে তিনি মার্কসের রচনার প্রতি আগ্রহী হন। তাঁর ব্যাপক পঠন-পাঠন মার্কস ও তাঁর মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে এবং রচনায় এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তিনি মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে সমালোচনার সঙ্গে গ্রহণ করেন (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৪৫-৬)।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কিশোর বয়স থেকে গল্প ও প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। ১৯৫১ সালে কলেজে পড়াকালে 'রচনাতেও বিপদ আছে' শিরোনামে তাঁর রচিত গল্প *সংবাদ*-এর খেলাঘরে প্রকাশিত হয় (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ৪৯৭-৮)। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ *অন্বেষণ* (১৯৬৪)। এতে বিশেষ করে "স্বাতন্ত্র্যের দায়" প্রবন্ধে তিনি বুর্জোয়া বিকাশের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছাত্রজীবনে এবং অধ্যাপনা জীবনের প্রথম দিকে বুর্জোয়াবিরোধী ছিলেন না (ইসলাম, সাহিত্যিকী, ১৪১০-১১, পৃ. ২৩৬-৭)। ১৯৫৯ সালে তিনি বৃত্তি নিয়ে দশ মাসের জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন। এসময় তিনি লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসবাদী প্রভাবশালী অধ্যাপক আর্নল্ড কেটেল-এর সমাবর্তন বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হন (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ৫৮০)। ইংল্যান্ডে পিএইচডি ডিগ্রি (১৯৬৫-৬৮) করার সময় তিনি মার্কসবাদী রচনা পাঠ করেন এবং রাজনীতিকে নিবিড়

পর্যবেক্ষণ করেন যা তাঁকে মার্কসবাদী মতবাদের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে। তিনি দেশে ফিরে মার্কসবাদী চিন্তাচর্চা আরম্ভ করেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে সমাজ পরিবর্তন, গণমানুষের মুক্তি এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য নিয়ে প্রবন্ধে সোচ্চার (আলী, ২০১২, পৃ. ২)।

যতীন সরকার অল্প বয়স থেকে পত্র-পত্রিকা পড়তে আরম্ভ করেন। কিশোর যতীন সরকার (বয়স ১৩ বছর) পত্রিকা পড়ে চীনের বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হন (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৩৮)। ১৯৫৫ সালে নেত্রকোনা কলেজে ভর্তির পর প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ফলে তাঁর ভাবনায় পরিবর্তন শুরু হয় (সরকার, ২০২২, পৃ. ২২১-৩, ২৩৯)। তিনি প্রথম রেবতী বর্মণের *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ* বইটি পড়েন। এই পুস্তক পাঠ করে যতীন সরকারের মার্কসীয় ইতিহাস-বীক্ষার হাতে খড়ি হয় (সরকার, ২০১৪, পৃ. ৫৯)। এ সময় কমরেড জ্যোতিষ বসু এবং অজয় রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁদের কাছে মার্কসবাদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৫২৯)। ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে বিএ (১৯৫৭-১৯৫৯) পড়ার সময় তিনি প্রগতিশীল সাম্যবাদী রাজনীতিতে যুক্ত হন। এ সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অলিখিত অফিস 'নয়া জামানা পুঁথিঘর' (১৯৫৪) নামক বইঘরে নিয়মিত যাতায়াত করেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ২৩৫)। এখানে তিনি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের রচনা পাঠ করেন। এ সময় তিনি মার্কসবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এখানে যতীন সরকার অনেক বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের কাছে মার্কসবাদের নিয়মিত তালিম নিতে শুরু করেন (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৩৮৭)। অধ্যাপনা জীবনের প্রথম দিকে সাহিত্য-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৭৬ সালের ৩ মার্চ থেকে ১৯৭৭ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত যতীন সরকারকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ময়মনসিংহ জেলে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জেলে থাকাকালে অন্য রাজবন্দিদের অনুপ্রেরণায় তিনি প্রবন্ধ রচনায় অধিকতর আগ্রহী হন (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৬২২)। পরবর্তীকালে অব্যাহতভাবে তিনি মার্কসবাদী প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি)-এর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। যতীন সরকার বলেন, "আমার নিজের পক্ষপাত মার্কসীয় দর্শনের প্রতি। তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতির অনুসরণে শ্রেণিদৃষ্টিতেই সকল সামাজিক সমস্যার স্বরূপ অবলোকনের আমি প্রয়াসী" (সরকার, ২০১৪, পৃ. ১২৬)।

**সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক**

সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক সাহিত্যের আধেয় ও আধার। এই দুটি সাহিত্যের মূল উপকরণ এবং এর উপর অন্য উপাদান-উপকরণের বিন্যাস নির্ভরশীল। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব মতে, সাহিত্য সমাজউদ্ভূত এবং সামাজিক প্রপঞ্চ সাহিত্যের বিষয়। কার্ল মার্কস বলেন,

> The mode of production of material life conditions the social, political and intellectual life process in general. It is not the consciousness of men that determines their beings, but on the contrary, their social beings that determines their consciousness (Marx, 1977, pp. Preface 20-1)।

সাহিত্যের আঙ্গিক বিষয়ের আধার। সাহিত্যের ফর্ম (আঙ্গিক/আধার) এবং কন্টেন্টের (বিষয়/আধেয়) মধ্যে কার্ল মার্কস কন্টেন্টকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি অবশ্য সাহিত্যে আধার ও আধেয়ের ঐক্যের ওপর জোর দেন। তিনি ভাব ও ভাষার বিরোধ স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ভাব ভাষা ভিন্ন থাকতে পারে না (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩)। কার্ল মার্কস রীতিসর্বস্ব লেখার ব্যাপারে বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) মতো মার্কস মনে করেন যে, সাহিত্যের আধার তার আধেয়ের দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত। তাঁরা উভয় বিশ্বাস করেন যে, আঙ্গিক কোনো শিল্পীর হাতের কারসাজি নয়, আধেয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধারের রূপান্তর ঘটে। সাহিত্যের আধারের পূর্বে আধেয়ের আবির্ভাব ঘটে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মার্কসবাদী সমালোচক র‍্যাফল ফক্সের (১৯০০-১৯৩৬) *দ্য নভেল অ্যান্ড দ্য পিপল*-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "আধার আধেয় দ্বারা সৃষ্ট ও আধেয়ের অনুরূপ, এবং যদিও আধেয়ের প্রাধান্য আছে তবু আধার আধেয়ের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ও কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে না" (নায়ক, ২০১৪, পৃ. ১৩৫-৬)।

সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে আহমদ শরীফ, যতীন সরকার স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। আহমদ শরীফ মনে করেন যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু চিরন্তন বা নির্ধারিত কিছু নেই। নগণ্য বিষয়বস্তুও লেখকের প্রতিভার শৈল্পিক রূপায়ণে চিরন্তন রসসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ভাব বা বিষয়বস্তুর চেয়ে রূপায়ণশক্তিই গুরুত্বপূর্ণ। "অন্যকথায় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে কঙ্কালস্বরূপ, ভাব হচ্ছে রক্তমাংস স্বরূপ এবং প্রাণ হচ্ছে প্রকাশভঙ্গি" (শরীফ, ২০০০, পৃ. ২১৭-৮)। আহমদ শরীফ "সাহিত্যের স্বরূপ", "নজরুলের কাব্যপ্রেরণার লক্ষ্য", "বঙ্কিম-মানস" শীর্ষক রচনায় (আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যতীন সরকার-এর রচনাবলী ১/২/৩ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরবর্তীতে শরীফ, চৌধুরী, সরকার, প্রকাশ সাল, পৃষ্ঠা লিখিত) প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি "বঙ্কিম মানস" প্রবন্ধে বিষয় ও রূপায়ণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মাটি এবং মাটি থেকে উৎপন্ন ঘাস যেমন এক রকম নয়, মাটির মধ্যে কাঁচা মাটি এবং পোড়া মাটি থাকে, তেমনি শব্দ ও পদের, আভিধানিক শব্দ ও কাব্যের চরণান্ত পদের অর্থ, সাহিত্য ও সাহিত্যের বিষয়বস্তুর

বিস্তর পার্থক্য ঘটে। এ কারণে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর উচ্চতা বা তুচ্ছতা দিয়ে সাহিত্যের রস পরিমাপ করা যায় না। শিল্পরস বা সৌন্দর্য সবকিছুর মূলে আসলে রস (শরীফ, ২০০০, পৃ. ১৭২)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মননশীল রচনায় সামাজিক অনুষঙ্গকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রবন্ধে তিনি সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, রাজনীতিকে বেছে নেন। আঙ্গিক ও বিষয় সম্পর্কে তিনি অধিক আলোচনা করেননি। তবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন, "ভিতটা তাঁকে (ঔপন্যাসিককে) গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায় (চৌধুরী, ২০০২, পৃ. ২৬২)।"

প্রাবন্ধিক যতীন সরকার অবশ্য মনে করেন যে সামাজিক বাস্তবতা থেকে লেখক বিষয়বস্তু চয়ন করেন। "বিষয়বস্তু সামাজিক উপাদান ছাড়া কিছু নয়" (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৫৫৭)। তাঁর মতে, বিষয় ও বিষয়বস্তু এক নয়। "বিষয়বস্তু মানে নিছক বিষয় বা সাবজেক্ট ম্যাটার নয়, বিষয়ের অন্তর্বস্তু কনটেন্ট" (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৫৫৭) আঙ্গিক বিষয় উপস্থাপনের কাঠামোশৈলী। বিষয়ের প্রয়োজনে আঙ্গিক নির্মিত হয়। বিষয়ের অন্তর্বস্তুর সঙ্গে মিশে গেলে আঙ্গিক বিষয়বস্তুর অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। খাঁটি শিল্পী বিষয়বস্তুর অনুগামী আঙ্গিক গ্রহণ করে নির্মাণে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়ে জননন্দিত হন। এ প্রসঙ্গে নিজের মতের সমর্থনে তিনি অর্নেস্ট ফিশারের মত তুলে ধরে বলেন, "শিল্পে তার বিষয়বস্তু অর্থাৎ সামাজিক উপাদানই শিল্পের রূপ, শৈলী বা আঙ্গিকের নিরূপক"(সরকার, ২০১৮, পৃ. ৫৫৭)। কিন্তু বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেন হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর মতে, কাব্যের তথা সাহিত্যের বিষয় থাকলেও বিষয়বস্তু থাকে না। আর বিষয়বস্তু বলে কোনো কিছুকে স্বীকৃতি দিতে হলে তাকে বলতে হবে 'সত্য' তথা 'সত্যের প্রগাঢ় শাঁস' (রহমান, ২০০০, পৃ. ০৭)। বুদ্ধদেব বসু বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিককে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। যদিও তিনি বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করেননি (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৫৫৬)। মার্কসবাদী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, আঙ্গিকপ্রীতি নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতি আনুগত্য ও এক ধরনের সংস্কার। তাঁর মতে, প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত এবং এর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬, পৃ. ৫১-৪)।

তিনজন প্রাবন্ধিক একতরফা কাঠামোবাদকে অস্বীকার করেন। সকলে একমত — বিষয়ের প্রয়োজনে আঙ্গিক নির্ধারিত হয়। আহমদ শরীফ ও যতীন সরকার মনে করেন যে, সাহিত্যের বিষয় সামাজিক উপাদান এবং বিষয় ও আঙ্গিকের মধ্যে বিষয়ই প্রধান। বিষয়ের গুণে সাহিত্যকর্ম উন্নত হয় না; রূপায়ণের গুণে তা উৎকর্ষ লাভ করে। যতীন সরকারের মতে, বিষয় ও বিষয়বস্তু এক নয়। বিষয় সাধারণ উপজীব্য আর বিষয়বস্তু মূল অভিব্যক্তি। তাঁদের অভিমতের সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে ঐক্যমত পোষণ করা যায়। বস্তুত সমাজবাদী ধারণায় বিষয় ও প্রকরণ সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধরূপে গোর্কির জীবন অবসানের

পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। এরপর সাহিত্যে আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি পড়ে এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নামে শাসকশক্তি যান্ত্রিক ভাষ্যে শিল্পসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ— এই দুয়ের মিলনে যে শিল্পসাহিত্য তা তাঁরা কার্যত অস্বীকার করেন। প্রকরণের অভিনবত্বকে বা আঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আদর্শচ্যুতির কাল্পনিক ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে সাময়িকভাবে এধরনের রক্তচক্ষু শিথিল হয়; কিন্তু অনতিকাল পরেই শিল্পসাহিত্যের আসরে আন্দ্রেই ঝানভ (১৮৯৬-১৯৪৮) আবির্ভূত হন। তিনি ১৯৪৬ সালের ১৪ই আগস্ট সৃজনশীলতাবিরোধী চিন্তা থেকে নির্দিষ্ট কাঠামো ও বিষয়ভিত্তিক রচনার জন্য শিল্পীসাহিত্যিকদের প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করেন (সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৫৮-৯)। এই যান্ত্রিক নির্দেশনা পরবর্তীকালে অধিকাংশ মার্কসবাদীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। মার্কস এবং তাঁর অধিকাংশ অনুসারীদের মত ও মন্তব্যগুলো থেকে এই মত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সমাজবাদী সাহিত্যের কনটেন্ট বা বিষয় সমাজের সজীব মানুষ এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত। এর অবস্থান সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। এই গণতান্ত্রিক সাহিত্য অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে উদ্ভূত হবে। বাস্তবতা এই সাহিত্যের প্রাথমিক কাঁচামাল (রায়, ১৯৭৬, পৃ. ১২৮)। এবং বিষয় অনুসারে প্রকরণ নির্ধারিত হবে। পরিচর্যার গুণে তুচ্ছ বিষয়ও সাহিত্যে মহৎ হয়ে ওঠে।

### সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

বুর্জোয়া মতাদর্শী এবং মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে শিল্পের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে বিপরীতমুখী অবস্থান লক্ষ করা যায়। প্রায় সকল বুর্জোয়া তাত্ত্বিক সাহিত্যে আনন্দবাদী এবং মার্কসবাদীগণ মানবকল্যাণবাদী। মার্কসের মতে, সাহিত্য হবে বাস্তবধর্মী। লেনিনের অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে সাহিত্য হবে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে সমাজের প্রতিটি স্তরে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট আলোড়নে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী সাড়া দেয়। এই শ্রেণিদ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে সমাজপরিবর্তন ও সমাজের গতিপথ নির্ধারিত হয়। মার্কসবাদ আশা করে, সাহিত্য গতিপথ নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ১৯০৫ সালের প্রবন্ধে লেনিন নিশ্চিত করেন যে, সাহিত্য গণমানুষকে ও তাঁদের চেতনাকে ধারণ করবে। তিনি বলেন,

> Literature must become part of the common cause of the proletariat, "a cog and a screw" of one single great Social-Democratic mechanism set in motion by the entire politically-conscious vanguard of the entire working class (Lenin, 2010, p. 45)।

এটা প্রয়োগের পদ্ধতিগত দিকনির্দেশনা দিয়ে ডিমিট্রিভ বলেন যে, এক্ষেত্রে সাহিত্যিকের কাজ শ্রমিক শ্রেণির পার্টি কমিন্টার্নকে সাহায্য করা এবং সাহিত্যকে হাতিয়ার

হিসেবে তুলে দেওয়া (গুহ, ১৯৭৫, পৃ. ৪২)। এ সম্পর্কে তপোধীর ভট্টাচার্য কর্মপরিধির বিস্তৃত ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাহিত্য শুধু রাজনৈতিক সংগঠনের পুষ্টি যোগালে হবে না; বরং সমাজবদলের সব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। জনগণের সঙ্গে সাহিত্যের সব সময় সরাসরি সংযোগ রক্ষা করা জরুরি। মার্কসবাদী শিল্পকলা ফাঁপা বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদী সাহিত্যিকগণকে পুরাতন গ্রন্থি ভেঙে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাবেন এবং সার্বিক মুক্তির পথ রচনা করবেন (ব্রেজনিভ, ১৯৮২, খণ্ড ২৬, পৃ. ২৬৬)। এক্ষেত্রে এঙ্গেলস সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করেন, “যে লেখক তাঁর নিজের মতকে যত বেশি সংগুপ্ত রাখতে পারেন, তাঁর রচনা শিল্প হিসেবে তত বেশি সার্থক হয়ে ওঠে” (সরকার, ২০১৮, পৃ. ২৭১)। প্লেখানভ মনে করেন যে, কলাকৈবল্যবাদ শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বিশ্বাস করেন, “যেখানেই শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নৈরাশ্যজনকভাবে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেন, সেখানে শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটে ও শেকড় বিস্তৃত হয়” (রহমান, ১৯৮৬, পৃ. ৫৩)।

প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ মনে করেন যে, সকল প্রকার শিল্পচর্চার পশ্চাতে জীবনের প্রয়োজনীয় ভাবসম্পদ এবং বিষয়কে প্রত্যক্ষ করার বাসনা ও প্রয়াস নিহিত থাকে। “অতএব ‘শিল্পের খাতিরে শিল্প’ তত্ত্বে বা কলাকৈবল্যবাদে কোনো সত্য নেই। কখনো ছিলও না” (শরীফ, ২০১০, পৃ. ৫৮৩)। কিন্তু তিনি একথা বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য আনন্দ থেকে সৃষ্ট। আর আনন্দ হতে রচিত হলে সাহিত্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তা অন্যের প্রাণকে নাড়া দেয় (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৭৪)। “কথাসাহিত্যের সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু” (শরীফ, ২০০০, পৃ. ১৭-৮) শীর্ষক প্রবন্ধে আহমদ শরীফ বলেন যে, মানুষের কল্যাণের দিক লক্ষ রেখে জীবন ও সমাজের সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করা উচিত। সাহিত্যের আদল ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি যোগ করেন যে, সাহিত্য মানবচরিত্র বিশ্লেষণ এবং সমাজের চিত্র তুলে ধরবে, পাশাপাশি ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পরোক্ষভাবে দিশা দেবে; এমনকি অতি সন্তর্পণে প্রভাবিত করবে এবং প্রত্যক্ষ ও উগ্র আদর্শ প্রচার থেকে বিরত থাকবে। তাঁর অভিমত, এযুগের লেখক হবেন জীবনশিল্পী। আহমদ শরীফ দাবি করেন, “জীবন-জীবিকা-সঙ্কট উত্তরণের জন্যই আজ কেবল ‘ফলিত’ (applied) সাহিত্য চাই” (শরীফ, ২০০৬, পৃ. ৩৯৭)। তাঁর মতে, মানুষের জীবন-জীবিকা সন্ধান ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং মানবতাবোধের প্রসার ঘটানো এ যুগের সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৩৪)। বস্তত মৌলিক বিবেচনায় পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যের উদ্দেশ্য আদর্শ ও প্রয়োজন অভিন্ন (আহসান, ২০১৯, পৃ. ৯৫)।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য কখনই বিশুদ্ধ শিল্পকলা নয়। জীবনের ভালো-মন্দের মিশ্রণের মতো সাহিত্য দোষ-গুণ মিশ্রিত (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ.

২৫১)। তাঁর মতে, পূর্বে সাহিত্য সৃষ্টির মূলে প্রয়োজনের প্রেরণা ছিলো; পরে সে আদর্শ বিচ্যুত হয়। তাঁর বিশ্বাস, পূর্বে ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ একটি প্রগতিশীল মতবাদ ছিলো। কারণ এর মাধ্যমে শিল্পকে পণ্য বানানোর প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিহিত আছে (চৌধুরী, ২০১২, পৃ. ১২৭)। “সাহিত্যের রাষ্ট্রবিরোধিতা” (চৌধুরী, ২০১২, পৃ. ১১৪) প্রবন্ধে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন যে, সাহিত্য বিনোদন অনুষ্ঠান কিংবা পণ্ডিতের পাঠশালা নয়। সাহিত্যে এই দুয়ের ভূমিকা আছে এবং এই দুটোই মূল কর্তব্যের অংশ। সাহিত্যের শিক্ষা হৃদয়ের, মস্তিষ্কের নয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, অনেক সাহিত্যিক সাহিত্যকে জীবনবিমুখ করার প্রবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি এর বিরোধিতা করে বলেন যে, সাহিত্য জীবনবিমুখ হলে ‘শূন্যকুম্ভ’ এবং ‘অত্যধিক’ ‘ধ্বনি’প্রধান হয়ে ওঠে (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ৩৭৫)। “স্বতঃস্ফূর্ত পলায়ন” প্রবন্ধে (চৌধুরী, ২০০২, পৃ. ২৫০) সাহিত্যে আনন্দবাদিতা প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, এই আনন্দ পাঠকের। তবে আনন্দলাভের সুযোগ কেবল ভাগ্যবান মানুষের ঘটে। আনন্দবাদী লেখকগণ বিত্তবান ও সুবিধাভোগীদের কথা চিন্তা করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ওই শ্রেণির মনের কথা লেখেন। এই লেখকগণ মাটিতে বিচরণ করলেও মানসবিহারী; তাঁরা মৃত্তিকাবিচ্যুত এবং গণমানুষবিমুখ।

যতীন সরকার মনে করেন যে, গণসংযোগের জন্য লেখক-কবিগণ ‘কলাকৈবল্যবাদে’র মতো প্রতারক শিল্পভাবনায় আচ্ছন্ন হন, যা অনুচিত। তিনি সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদী মতবাদের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে কবি ইভগেনী ভিনোকুরভ-এর ভাষায় বলেন, “কবিতার অর্থ জীবনের অর্থের সঙ্গে অভিন্ন; জীবনের যদি অর্থ থাকে, কবিতার অর্থ থাকবেই” (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৫২৩)। স্পষ্টতই ‘সৌন্দর্য সৃষ্টিই শিল্পের মূল উদ্দেশ্য’ — এই আপ্ত বাক্যে যতীন সরকার বিশ্বাস করেন না (সরকার, ২০১১, পৃ. ১১৮)। তিনি উপযোগবাদী হয়েও এ কথা স্মরণ করিয়ে দেন, “ভাববাদী মাত্রই প্রতিক্রিয়াশীল, আর যে-কোন বস্তুবাদীই প্রগতিশীল — এমন ধারণা যান্ত্রিকতাদোষে দুষ্ট এক দুর্মর কুসংস্কার” (সরকার, ২০১১, পৃ. ১১২)। এ বিষয়ে মার্কসবাদী প্রকাশ রায় প্রাবন্ধিকগণের অভিমতকে সমর্থন করেন। তিনি সাহিত্যে উপযোগবাদকে যথার্থ আখ্যায়িত করে বলেন যে, নিছক সৌন্দর্যচেতনা ‘বস্তাপঁচা বুলির অপভ্রংশ’ (গুহ, ১৯৭৫, পৃ. ২৮)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি (আনন্দলাভ) এবং মানবজাতির উপকার উভয়ই সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন (শরীফ, ২০১৪, পৃ. ১১৬)। হাসান হাফিজুর রহমান কলাকৈবল্যবাদী বা জীবনবাদী উভয় সাহিত্যিকের শিল্পসৃষ্টির শেকড় জাগতিক প্রয়োজনে বাঁধা বলে বিশ্বাস করেন (রহমান, ২০০০, পৃ. ০৭)। একথা সর্বজন বিদিত যে, বুর্জোয়া অধিকাংশ তাত্ত্বিক কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা আনন্দবাদী এবং বিশুদ্ধ শিল্পকলাচর্চায় বিশ্বাস করেন (মুখোপাধ্যায়, ২০২০, পৃ. ৩২)। কলাকৈবল্যবাদীগণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ শিল্প উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ; এটা মঙ্গললাভের সহায়ক সামগ্রী নয় (মুখোপাধ্যায়, ২০২০, পৃ. ৩১)।

আলোচ্য তিনজন প্রাবন্ধিকই সাহিত্যকে গণমুখী ও জীবনমুখী করে তোলার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা সাহিত্যের কাছে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের ভূমিকা প্রত্যাশা করেন। আহমদ শরীফ ও যতীন সরকার এঙ্গেলসের অনুসরণে সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখার পক্ষে। যতীন সরকার সাহিত্যে কেবল মানবকল্যাণবাদী। কিন্তু আহমদ শরীফ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহিত্যে একই সঙ্গে আনন্দবাদী ও মানবকল্যাণবাদী। আহমদ শরীফের মতে, সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দ লেখকের, কিন্তু সিরাজুল ইসলামের মতে, সাহিত্যে আনন্দ পাঠকের। তাঁদের এ সকল অভিমতের ব্যাপারে বলা যায়, সাহিত্য হবে জীবনমুখী ও সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। এর লক্ষ্য আনন্দ ও মানবকল্যাণ — উভয়ই। এর আনন্দ লেখক-পাঠক উভয়ের। লেখকের সৃষ্টির আনন্দ এবং পাঠকের পাঠের আনন্দ। কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা ইমানুয়েল কান্ট শিল্পের ক্ষেত্রে "উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যবাচকতা" নীতি প্রবর্তন করেন (হোসেন, ২০২০, পৃ. ২১৬)। কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টি কেবল আনন্দলাভের (pleasure) জন্য — দার্শনিক প্লেটো ছাড়া খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মীয় গুরু, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই মতের বিরোধিতা করেন (প্রধান, ২০২২, পৃ. ১৪৯)। অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ*-এ কলাকৈবল্যবাদীদের পাগলের সঙ্গে তুলনা করেন (প্রধান, ২০২২, পৃ. ১৪৯)। বাস্তবে দেখা যায়, সাহিত্যপাঠক আনন্দ (রসাস্বাদন ছাড়া) না পেলে শিল্পের পাঠ ও শিক্ষা নিতে চায় না। সুতরাং নিছক কলাকৈবল্যবাদ বা উপযোগবাদ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

## জীবন ও সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক

জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অন্যকথায় সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব। কিন্তু সেই জীবনের স্বরূপ কী চর্চিত জীবন না কল্পিত বা কাঙ্ক্ষিত জীবন? এই মৌলিক জিজ্ঞাসার সমাজবাদী জবাব খুঁজতে মার্কসবাদের পুরোধাদের শরণাপন্ন হতে হবে। কার্ল মার্কস সাহিত্যে বাস্তবজীবনচিত্রণ কামনা করেন (মুখোপাধ্যায়, ২০১৪, পৃ. ১৩৫)। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক গীতিকবিতা অসংযত প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ বলে তিনি নিজেই তা পুড়িয়ে ফেলেন (নায়ক, ২০১৪, পৃ. ১৩৫)। এরূপ কর্ম থেকে বাস্তবের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন অনুধাবন করা যায়। এঙ্গেলস মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা পত্রে বাস্তবতার রূপায়ণ প্রসঙ্গে বলেন,

> "Realism to my mind implies besides truth of detail the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances" (Engels, 1888)।

সমাজবাদী তাত্ত্বিকগণও একমত — সাহিত্য হবে বাস্তবের শৈল্পিক রূপায়ণ। কিন্তু বাস্তবচর্চার স্বরূপ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কিত কৌতূহলের প্রাথমিক উত্তর পাওয়া

যায় ১৯০৫ সালে লেনিন লিখিত "পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য" শীর্ষক একটি মৌলিক প্রবন্ধে। এখানে তিনি বলেন, শিল্পসাহিত্য 'আত্মেতর বাস্তবের প্রতিফলন' এবং 'মুকুরের মতো সামাজিক বাস্তবকে প্রতিফলিত করে'। এ অভিমতের সঙ্গে মৌলিকার্থে কোনো মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সাহিত্যসমালোচক দ্বিমত পোষণ করেননি (সরকার, ২০১৮, ২৬২)। তবে এই প্রতিফলনের 'স্বরূপ ও প্রকৃতি' নিয়ে বোদ্ধামহলে বিতর্ক ও ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় (সরকার, ২০১৮, পৃ. ২৬২)। ম্যাক্সিম গোর্কি ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত অভিভাষণে বাস্তবতার প্রতিফলন ব্যাখ্যা করেন। ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি এই ভাষণে বলেন, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি জীবনকে কর্মময় এবং সৃষ্টিশীল রূপে' দেখে। তিনি মানুষের মূল্যবান ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও প্রতিভার বাধাহীন বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে পৃথিবীর সকল মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দে বাঁচার উপযোগী উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ওপর তাগিদ দেন। (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫৮)। একইভাবে চল্লিশের দশকের গোড়ায় মাও সে তুং শিল্পসাহিত্য-বিষয়ক 'ইয়েনান ভাষণ'-এ চীনে বিরাজমান বাস্তবচিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৬০)। বাঙালি মার্কসবাদী সাহিত্যবোদ্ধা প্রকাশ রায় এর সৃজনশীল ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাহিত্য কেবল জীবনের প্রতিলিপি নয়, জীবনের সমালোচনাও। সাহিত্যে সমকালের সামাজিক বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎকালের ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হয় (গুহ, ১৯৭৫, পৃ. ২৯)।

সমাজবাদী প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যতীন সরকারও এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। আহমদ শরীফ নিশ্চিত করেন যে, জীবন নিয়েই সাহিত্য। জীবনকে দেখা, জানা এবং বোঝার জন্যে সাহিত্য রচিত হয় (শরীফ, ২০১৬, পৃ. ৫০৭)। "কথাসাহিত্যের সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু", "বাউল মত ও সাহিত্য" (শরীফ রচনাবলী, ২০০০), "ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী" (শরীফ রচনাবলী, ২০১০) প্রবন্ধে আহমদ শরীফ এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন যে, সাহিত্য সমকালীন জীবন ও জীবনবোধের প্রতিফলন। "সাহিত্য জীবনালেখ্য নয়, জীবনবোধের অভিব্যক্ত সাক্ষ্য। এজন্যেই "সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর বলে স্বীকৃত" (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৫৬৫)। আহমদ শরীফ একই কথা বলেন "সাহিত্যের রূপকল্প ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা" এবং "কথাসাহিত্যের সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু" (শরীফ রচনাবলী, ২০০০) প্রবন্ধদ্বয়ে। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, আজকের দিনে সাহিত্য জীবনশিল্প। এই জীবন বলতে তিনি সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনসহ মনোজগতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং মনোজগতের স্বরূপ উদ্ঘাটনকে বোঝান। তাঁর মতে, সাহিত্য কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণ। বাস্তব থেকে গৃহীত হলেও বাস্তবে তা সত্য নয়। সাহিত্যের উপলব্ধি ও অনুভূতিগুলোও বাস্তবনির্ভর হয়েও অনুভূতি ও উপলব্ধিজাত বয়ান। অনুভূতি বাস্তবাহৃত,

বাস্তবনির্ভর ও বাস্তবানুগ হয়েও তা বাস্তবাতিরিক্ত এবং কল্পনানির্ভর হয়েও কল্পনাসর্বস্ব নয়। সাহিত্য নিছক কল্পনা-আশ্রয়ী হতে পারে না। কারণ "ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কল্পনা অসম্ভব" (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৪৩)। তাঁর মতে সাহিত্যে কেবল বাস্তব সামাজিক চিত্র উপস্থাপন করলে সাহিত্য নকশা হয়ে পড়ে। সদর্থক আকাঙ্ক্ষাকে চিত্রিত করা ও দিশা দেওয়া সাহিত্যিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। একই সঙ্গে উন্নয়ন ও বিকাশ প্রচেষ্টা চালানোর লেখকের কাজ (শরীফ, ২০০০, পৃ. ২৭৫)।

এ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন যে, বাস্তবই সাহিত্যের আশ্রয়। তিনি বাস্তব ও অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার উপর জোর দেন এবং দাবি করেন যে কেবল ফাঁপা আবেগ দিয়ে সাহিত্য রচনা করলে সাহিত্য নিশ্চিত অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ২২৭)। তিনি কেবল সাহিত্যে বাস্তববাদী নয়, বিজ্ঞানমনস্কও। তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করে তাঁর "লেখকের কথা"র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেন, "এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব — তাতে শুধু পুরানো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সাহিত্য বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক হলে, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিংস্র মানুষের হাতে মারণাস্ত্রই তুলে দেবেন" (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ৪২২)। অর্থাৎ সাহিত্যকে তিনি যুক্তি ও কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী। তিনি আরও আশা করেন যে সাহিত্য স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্যকে উন্মোচিত করবে (চৌধুরী, ২০০৬, পৃ. ১৯৭)। তিনি সাহিত্যে বাস্তবচর্চার জন্য দ্বীনবন্ধু মিত্র এবং মীর মশাররফ হোসেনের সমাজবাস্তবতা কেন্দ্রিক নাটক ও উপন্যাস রচনার জন্য প্রশংসা করেন (চৌধুরী, ২০০৪, পৃ. ৪২৬)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মার্কসবাদের সৃজনশীল ব্যাখ্যার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। মার্কসবাদে সাহিত্যকে উপরিকাঠামোরূপে চিহ্নিত করা হয়। তিনি মনে করেন যে অবকাঠামো দেখে উপরিকাঠামোর (সাহিত্য-সংস্কৃতি) নির্ণয় অনেক সময় যান্ত্রিক হতে পারে। কেননা সংস্কৃতি কেবল ছায়া নয়, মানুষের উপর সংস্কৃতি একটি প্রভাবক শক্তিও। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণি তাদের সংস্কৃতিকে শাসিতশ্রেণির উপর চাপিয়ে দেয় যা বলপ্রয়োগের চেয়েও অধিক কার্যকর। এন্তোনিও গ্রামসি উপরিকাঠামো দেখে অবকাঠামো চেনা যায় বলে যে, অভিমত প্রকাশ করেন তাকে মার্কসবাদী সাহিত্যে একটি সৃজনশীল সংযোজন বলে মনে করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (চৌধুরী, ২০০৬, পৃ. ৩৯৩)।

যতীন সরকার শিল্পসাহিত্যে বাস্তববাদের সমর্থক। কেবল বাস্তববাদই নয়, তিনি বাস্তববাদের বিশিষ্ট রূপ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে গুরুত্ব দেন। কারণ এটা ঘটনা-পরিপ্রেক্ষিতের কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপনসহ সদর্থক জীবনকে উপস্থাপন করে (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫২-৩)। কিন্তু তিনি প্রকৃতিবাদে থেমে থাকেননি। যতীন সরকার বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারটি কেবল লেখকের মর্জিমাফিক নয়। তিনি কবিতা প্রসঙ্গে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন, "কবিতা নির্মাণের ব্যাপারটি নিরঙ্কুশভাবে কবিকর্ম নির্ভর নয়, কবিতার বাইরে

বস্তুভুবন থেকেই এর সকল উপাদানের যোগান আসে" (সরকার, ২০১১, পৃ. ৭১-২)। কবির সামাজিক অবস্থান, সচেতন ও অবচেতন শ্রেণিদর্শন, জীবনযাপন প্রণালী — সবই তার কবিতার বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক। তিনি কবিদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও বলেন যে, সাম্যবাদী কবিগণ ধনতন্ত্রের পঙ্কিলময় পৃথিবীতে বাস করে শোষণমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্নসৃষ্টি করবেন বলে একই প্রবন্ধে মন্তব্য করেন। শোষিত মানুষের জীবনসংকট সবকালে বিদ্যমান। কবি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধনী ও মধ্যবিত্তকে উৎপাদক নিঃস্ব-সর্বহারার পাশাপাশি স্থাপন করলে শোষকশ্রেণি ও শোষিতশ্রেণির চিত্র স্পষ্ট হয় (সরকার, ২০১৮, পৃ. ৫২৬)। যতীন সরকার মনে করেন যে, শ্রম সংস্কৃতির উৎস এবং শ্রমসংশ্লিষ্ট গণমানুষ সংস্কৃতির স্রষ্টা; এজন্য অবশ্যই সংস্কৃতি-সাহিত্য গণমানুষসংলগ্ন হতে হবে (সরকার, ২০১১, পৃ. ৯৮)। লোককবিগণ সযত্নে এ কাজটি করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, "লোককবিদের জীবনচেতনা মৃত্তিকাসংলগ্ন, সমাজসংশ্লিষ্ট ও বাস্তবানুগ। এক ধরনের আদিম বস্তুবাদের ঐতিহ্য তাঁরা চেতনায় ধারণ করেন" (সরকার, ২০১২, পৃ. ২৩৬)। যতীন সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে শিল্প প্রকৃত বাস্তবের প্রতিফলন ঘটায় এবং খাঁটি শিল্প মানুষের নিকট নতুন অভিব্যক্তির জন্ম দেয়। (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫৬)। শিল্পী-সাহিত্যিকের মস্তিষ্কের বিশিষ্ট 'টাইপ'-এর কারণে শিল্পী-সাহিত্যিকের মনে বা চেতনায় সাধারণ মানুষের চেয়ে সমাজ ও প্রকৃতির ভিন্ন এক সত্যের প্রতিফলন ঘটে; তা-ই সমাজবাদী সাহিত্যে রূপায়িত হয় (সরকার, ২০১৮, পৃ. ২৬৫)। তিনি মনে করেন যে, সাহিত্যে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ায় উদ্ভাবিত ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের মধ্যে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমই আদর্শ (সরকার, ২০১১, পৃ. ১২৫)। যতীন সরকারের অনড় বিশ্বাস, "সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের শরণ নেয়া ছাড়া সাহিত্যশিল্পের সঙ্কটমুক্তি সুদূর পরাহত" (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৭৮)।

প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সাহিত্যে বাস্তববাদ বলতে জীবন ও সমাজের কদর্য, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, ক্লান্তি-হতাশা তথা সকল নাস্তিবাচকতার চর্চাকে বোঝায়। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৮৯৪-১৯৭১) জীবনকে এরূপ কদর্যময় ও বিকৃত করে চিত্রিত করার একপাক্ষিক বাস্তবতার ধারণাকে নাকচ করে দেন। তিনি (সোভিয়েত) লেখক ও শিল্পীদের কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে সম্পূর্ণ প্রতিভাকে সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত করার আহ্বান জানান (চক্রবর্তী, ২০২০, পৃ. ৬৯)। সুতরাং বোঝা যায়, সমাজবাদী সাহিত্যে বাস্তবের রূপায়ণ একটি আবশ্যিক কাজ। শিল্পবোদ্ধার কাছে শিল্প কাল্পনিক বাস্তবের প্রকাশ। প্রকৃতিতে অনুপস্থিত বিষয়ও শিল্পে স্থান পেতে পারে। সব মহৎ শিল্পসাহিত্য মিথ্যার ভেতর দিয়ে সত্য উদ্ভাসিত করে। অন্তত তা সত্যকে অনুধাবন করতে শেখায় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২০, পৃ. ১৫২)।

আলোচ্য তিনজন প্রাবন্ধিক শিল্পে বাস্তবচর্চার সমর্থক এবং তাঁরা মনে করেন যে, সাহিত্য জীবনশিল্প। এক্ষেত্রে আহমদ শরীফ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রিয়ালিজমের এবং সার্বিক জীবন রূপায়ণের সমর্থক, কিন্তু যতীন সরকার সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সমর্থক এবং তিনি কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করে নিম্নবিত্ত মানুষের রূপায়ণের ওপর জোর দেন। আহমদ শরীফ বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রণ অবধারিত মনে করেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহিত্যে বিজ্ঞানমনস্ক। সকলের মতে, সাহিত্য ও সমাজের পারস্পরিক প্রভাব আছে।

উপর্যুক্ত তিনজন প্রাবন্ধিকের অভিমত সম্পর্কে বলা যায়, সাহিত্যে রিয়েলিজমের অনুশীলনই কাম্য। এখানে সার্বিক জীবনচর্চাই প্রত্যাশিত। শিল্প নিরেট বাস্তব নয়। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক রিয়ালিজমের ব্যাখ্যা তাত্ত্বিকভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় — লেনিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'-এর ধারণাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসের সময়ই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কথাটি বহুবার ব্যবহৃত হয় (পাল, ২০১৪, পৃ. ১৫০-১)। ১৯৩২ সালের ২০ মে শিল্পী সংঘের সম্পাদক গ্রোনস্কি পার্টি অভীপ্সিত 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' কথাটি উত্থাপন করেন। *প্রাভদা* পত্রিকায় ৬ মে ১৯৩৪ সালে কথাটা প্রথম প্রযুক্ত হয়। এ বছর ২৬ অক্টোবর মাক্সিম গোর্কির বাড়িতে লেখকদের এক সভায় স্ট্যালিনও কথাটি ব্যবহার করেন। গোর্কি কথাটি ঘুরিয়ে বলেন, পৃথিবী পুনর্গঠনকারী 'জনগণের বাস্তবতা'। গোর্কি এর চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন, যথা– সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কর্মসূচি, সমষ্টিবদ্ধতা, আশাবাদ এবং শিক্ষামূলকতা। মুক্ত ইউরোপে এই মতবাদের আলোচনা গৎবাঁধা নিয়মে এগোয়। এর দ্বারা মাও সে তুং চীনে বিরাজমান বাস্তবতাকে বোঝান, আবার ১৯৪৬ সালে রাশিয়ায় ঝানভ একে অতীত-বর্তমান ত্যাগ করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে বোঝান। অন্য সমালোচকের কাছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মানবজীবন ভাবনার শৈল্পিক প্রতিফলনমূলক সাহিত্য (আহসান, ২০১৯, পৃ. ৯৬)। কেউ কেউ একে নিরেট বাস্তবের প্রতিফলন নয়; বরং সাহিত্যিকগণের মস্তিষ্কে বাস্তবের প্রতিফলনজাত নতুন সৃষ্টি হিসেবে অভিহিত করেন। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবের পরিবর্তে সাহিত্যকে বাস্তববাদের চর্চা হিসেবে বিবেচনা করলে সব ধরনের বাস্তবচর্চার দ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং বিতর্কের অবকাশ থাকে না।

### শিল্পীর দায় ও দায়িত্ব

শিল্পী সমাজের প্রতিনিধি। এজন্য সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের প্রতি তাঁর ওপর দায় ও দায়িত্ব বর্তায়। মার্কসবাদ প্রত্যাশা করে শিল্প জীবন ও সমাজকে বদলে দেবে। এটা সমাজ বদলেরই হাতিয়ার। এর জন্য শিল্পীকে সচেতন থাকতে হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নে *নারদনস্ত* (Narodnost) বা 'জনতার আর্ট' নীতি

গৃহীত হয়। এই নীতির মূলকথা শিল্পকর্মকে তার যুগের মেহনতি জনতার কাছে বোধগম্য ও উপভোগ্য হতে হবে। এতে থাকবে সমাজসচেতনতার সংহত রূপ এবং বর্তমানের নিরিখে ভবিষ্যৎ প্রগতিশীল সমাজবিকাশের সম্ভাবনা (হোসেন, ২০১৪, পৃ. ৭৯)। লেনিন বলেন যে, নান্দনিক চিন্তার 'স্নায়ুকেন্দ্র' জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ রক্ষা করা জরুরি। কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে সমাজবদলের কার্যক্রম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না। মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লড়াই আর সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিমানবায়নের আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর লড়াইকে মানুষের সার্বিক মুক্তির পথে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন (ভট্টাচার্য, ২০০৭, পৃ. ১৭৬-৭)। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সামাজিক দায় ও দায়িত্বকে বহন করতে হয়। মার্কসবাদীদের এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্ট্যালিন লেখকদের ভূমিকাকে সূত্রবাক্যে বলেন, "লেখকরা হচ্ছেন 'মানবাত্মার কারুকর্মী" (রায়, ১৯৭৫, পৃ. ৪৫)। সাহিত্যে লেখকের দায় ও দায়িত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, শিল্পী স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। লেনিন বুর্জোয়া লেখকদের পরম স্বাধীনতার দাবিকে ভণ্ডামি আখ্যায়িত করে বলেন,

> This absolute freedom is a bourgeois or an anarchist phrase (since, as a world outlook, anarchism is bourgeois philosophy turned inside out). One cannot live in society and be free from society. The freedom of the bourgeois writer, artist or actress is simply masked (or hypocritically masked) dependence on the money-bag, on corruption, on prostitution. (Lenin, 2010, p. 48).

প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ লেখকদের গুরু দায়িত্বের কথা বিস্তারিতভাবে রচনায় উল্লেখ করেন। তাঁর মতে শিল্পী-সাহিত্যিকগণের দায়িত্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও প্রসারণ ঘটানো (শরীফ, ২০০০, পৃ. ২৭৪)। বিষয়টি অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সাহিত্যিক-শিল্পীগণের পবিত্র দায়িত্ব সমাজের অন্যায়, শোষণ, পীড়নের বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করা এবং গণমানুষের কল্যাণ চিন্তা ও কর্মে দিশারীর ভূমিকা পালন করা। লেখকগণ জরুরি কর্তব্য হিসেবে উচ্চকণ্ঠে গণবিরোধী চিন্তা ও কর্মের প্রতিবাদ করবেন এবং আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। শিল্পীরা নিরক্ষরদের মাঝে অক্ষরজ্ঞানের স্পৃহা জাগাবেন, হতাশাগ্রস্ত-বঞ্চিত বুকে আশার প্রদীপ জ্বালাবেন, সংগ্রামের প্রেরণা যোগাবেন এবং নিষ্ক্রিয়কে সক্রিয় করবেন। মানুষের স্বাধিকার লাভের প্রবর্তনা এবং বাঁচার পথ বাৎলে দেওয়াও লেখকের কর্তব্য। তাঁরা গণচেতনা সঞ্চার ও প্রচারের একাজে গণমাধ্যমগুলোকে উত্তম মাধ্যমরূপে ব্যবহার করবেন। এককথায় গণমানুষের জন্য গণমানুষের হয়ে তাঁদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করে সঠিক পথে পরিচালিত করাই শিল্পীর

দায়িত্ব। আহমদ শরীফ মনে করেন যে, এসব কিছুর চূড়ান্ত লক্ষ্য গণমানুষের মুক্তি। সাহিত্যিকগণ মানবতার জন্য শ্রেণিস্বার্থ ভুলে গণমানুষের মুক্তির সংগ্রামে সাহিত্যকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবেন। শোষিত মানুষের সংগ্রাম ও আশা-আকঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করা মার্কসবাদী শিল্পীর কর্তব্য।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, সাহিত্যিকের কাজ সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ রচনা করা এবং সমাজে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করা। এই দুটি কাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর মতে, সকল সমস্যার মূলে বৈষম্য। সামাজিক বিশৃঙ্খলার মূলেও সামাজিক অসাম্য। সাহিত্যিকের কাজ বৈষম্য থেকে মুক্তির পথ রচনা করা। কিন্তু বুর্জোয়া লেখক নিজে সমাজবিচ্ছিন্ন বলে সে দায়িত্ব পালন না করে সমাজবিচ্ছিন্নতার আদর্শ প্রচার করেন। এঁরা অর্থের কাছে বন্দি। প্রকৃত সাহিত্যিকের কাজ সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। বর্ণবিভক্ত সমাজে সংস্কৃতিও বিভক্ত বলে কাজটি সম্ভব নয়। তাছাড়া পুঁজিবাদ সংস্কৃতিকে দুর্বল করে রাখে। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির নাজুক অবস্থা এ কারণে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন যে, মানুষের সার্বিক মুক্তির সঙ্গে সাংস্কৃতিক মুক্তি জড়িত। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি এক প্রভাবশালী উপকরণ। এ কাজে সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীগণ প্রথমে বিপ্লবী, তারপর সংস্কৃতিসেবী হতে হয়। বিপ্লব সৌখিন কাজ নয়, পেশাদারী কাজ। এ জন্য সংস্কৃতিসেবীর বা সাহিত্যিক কাছে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রত্যাশিত। তিনি আশা করেন যে, বাংলাদেশের নতুন সমাজ নির্মাণের পথে সাহিত্যিকগণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ১৪৪-৭২)।

যতীন সরকার মনে করেন যে, সাহিত্যচর্চা উদ্দেশ্যহীন সৌখিন আনন্দচর্চা নয়। এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তাঁর অভিমত, শিল্পকলাকে অসাধারণ দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হবে। সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমাজসত্যকে প্রকাশ করবে। সাহিত্যিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে ধারণ করবেন (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫৬-৭৩)। তাঁরা সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। তিনি টলস্টয়ের ভাষায় বলেন, "শিল্পকলা অবশ্যই সমাজ থেকে হিংসার নির্বাসন ঘটাবে" (সরকার, ২০১১, পৃ. ১২২)। এজন্য মার্কসবাদী সাহিত্যিককে অবশ্যই উদার ভাবাপন্ন এবং মুক্তচিন্তক হতে হবে (সরকার, ক২০১১, পৃ. ৪৮)। যতীন সরকারের মূলকথা শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি পেশাজীবীকে দায়িত্বসচেতন করা লেখকের কর্তব্য এবং গণমানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাই লেখকের চূড়ান্ত লক্ষ্য (খাতুন, ২০১৮, পৃ. ২৬৩)। সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের মূল কারণ অন্যায্য বিধি। এই অন্যায্য বিধির বিরুদ্ধে পরিবর্তনশীল অভিব্যক্তি প্রকাশ করেই লেখকের দায়িত্ব শেষ হয় না (ভট্টাচার্য, ২০০৭, পৃ. ১৭৭)। মার্কসবাদ কেবল তত্ত্ব নয়, কর্মপন্থা। এজন্য এর বাস্তবায়নের কিছুটা দায়িত্ব লেখককেও নিতে হয়। কিন্তু পথটি সহজ ও মসৃণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। মার্কসবাদী সাহিত্যিকের এই শ্রমসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করতে

হয়। রাল্‌ফ ফক্স, কডওয়েল, হাওয়ার্ড ফাস্ট (১৯১৪-২০০৩) প্রমুখ শ্রমিকশ্রেণির জন্য এই দায়িত্ব পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (গুহ, ১৯৭৫, পৃ. ৪২)।

উপর্যুক্ত তিনজন প্রাবন্ধিক মনে করেন যে, সাহিত্যিক দায়িত্ববান পথপ্রদর্শক ও কর্মীর ভূমিকা পালন করবেন। তাঁরা গণমানুষের আশার জাগরণ থেকে পথনির্দেশনা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছোনোর দায়িত্ব পালন করবেন এবং সামাজিক ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে সক্রিয় থাকবেন। তাঁদের কর্মপন্থাটি হবে সাংস্কৃতিক। গণমানুষের সার্বিক মুক্তির অন্যতম উপকরণ হিসেবে সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ ধরে লেখক এগোবেন। তাঁদের এ সকল অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত করার কোনো কারণ নেই। তবে পথটি যান্ত্রিক ও নীরস হলে চলবে না, নান্দনিক হতে হবে। উপরন্তু মার্কসবাদীকে মার্কসিস্ট মৌলবাদী হলেও চলবে না। বস্তুত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর 'কমিটমেন্ট' তথা দায়বদ্ধতাকে কোনো শাস্ত্রবাক্য, মতবাদ বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কঠোর নিয়মে বাঁধা ক্ষতিকর। সাহিত্যশিল্পে 'কমিট্‌মেন্ট' শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বেচ্ছাকৃত দায়বদ্ধতা (আচার্য, ২০২০, পৃ. ১৩৫)।

### সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ

মার্কসবাদ আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। এর লক্ষ্য সকল মানুষের মুক্তি। মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত বিবেচনায় সমগ্র মানব একটি জাতি। সাহিত্য এই মানবজাতির মঙ্গলসাধনের অন্যতম উপকরণ। তবে বিশেষ দেশের সাহিত্য বিশেষ দেশের মানুষের মঙ্গলসাধনে লিপ্ত হবে — না পৃথিবীর সব মানবমঙ্গলে ব্যাপিত হবে — অর্থাৎ সাহিত্য জাতীয় না আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হবে — এর সদুত্তর পেতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিকদের মতামত খতিয়ে দেখা দরকার। কার্ল মার্কসের মতে, উৎকৃষ্ট শিল্পসাহিত্য কাল ও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করে যায়। তিনি প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন (হোসেন, ২০১৪, পৃ. ৭৭)। প্লেখানভ বলেন, "ভাব-আধেয় ব্যতীত কোনো শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু শিল্পী যদি তার রচনার কালের প্রধান সামাজিক প্রবণতার প্রতি অন্ধ হয়ে যান, তখন তার রচনার ভাব-আধেয় অন্তর্নিহিত মূল্য গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনিবার্যভাবে রচনার পরিণতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়" (রহমান, ১৯৮৬, পৃ. ৫২)। কার্ল মার্কস-লেনিন সর্বহারাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেন। কিন্তু লেনিন সর্বহারাদের স্বতন্ত্র 'প্রোলেটকাল্ট' স্বীকার করেননি। এ জন্য রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপর সোভিয়েত ইউনিয়নের অতি-উৎসাহী সমাজতন্ত্রীদের 'প্রোলেটকাল্ট' নামে সর্বহারার সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টির চেষ্টা এবং প্রাক-সমাজতন্ত্রী যুগের সব শিল্পসংস্কৃতির উচ্ছেদের তৎপরতা লেলিন সমর্থন করেননি। তিনি মানবসভ্যতার দুই হাজার বছরের মহৎ ও মূল্যবান অবদানকে মার্কসবাদে আত্তীকরণ করেন (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫৭)। লেনিনকে অনুসরণ করে ম্যাক্সিম গোর্কি ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখকদের প্রথম

কংগ্রেসে প্রদত্ত অভিভাষণের শেষে সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতার দর্শনটি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, শিল্পসাহিত্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে — প্রাকৃতিক শক্তির এবং অমানবিক পরিবেশের বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে মানবতার বিজয় অর্জনের মাধ্যমে মানুষের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আনন্দ সৃষ্টি এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করে পৃথিবীকে সমস্ত মানুষের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবারের আবাসভূমিতে পরিণত করার অনুকূল পরিবেশ রচনা করা (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫৮)।

সাহিত্যে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ মনে করেন যে, প্রেম-পীড়ন, ক্রোধ-সহিষ্ণুতা, লোভ-অসূয়া, ক্ষমা-প্রতিহিংসা, কৃতজ্ঞতা-অকৃতঘ্নতা প্রভৃতি জৈববৃত্তির প্রতিক্রিয়া দেশভেদে অভিন্ন, কেবল ব্যক্তিভেদে তারতম্য ঘটে। তাই, "যথার্থ সাহিত্য-রস দেশ-কালের উর্ধ্বে সর্বমানবিক" (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৫২৮)। তিনি অবশ্য এটা স্বীকার করেন, "দেশ-কাল নিরপেক্ষ জীবনানুভূতি নেই" (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৫৩০)। আহমদ শরীফ "সাহিত্যে দেশ কাল ও জাতিগত রূপ" (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৫৪১) প্রবন্ধেও একই কথার প্রতিধ্বনি করেন। আহমদ শরীফ "কেজো ও অকেজো সাহিত্য", "গণসাহিত্য", "সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য", "সাহিত্যে দ্বিতত্ত্ব", "সাহিত্যে দেশ কাল ও জাতিগত রূপ" (শরীফ, ২০০০) প্রভৃতি প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, সাহিত্য জীবনসম্পৃক্ত; আর জীবন জীবিকাভিত্তিক। জীবন অবলম্বনহীন হতে পারে না। দেশ, কাল, প্রতিবেশের ছাঁচে জীবন গড়ে ওঠে। এই তাৎপর্যে সাহিত্য প্রতিবেশউদ্ভূত জীবনকথা। এজন্য সাহিত্য মাত্রই শাস্ত্র, সমাজ, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার এবং দেশ, কাল, প্রতিবেশ প্রভাবিত (শরীফ, ২০০০, পৃ. ২৫)। আহমদ শরীফ যোগ করেন যে, সাহিত্যের বিষয়, ভাষা, ভঙ্গি, আদর্শ, উদ্দেশ্য, সমস্যা প্রভৃতি হবে স্থানিক ও কালিক; কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকবে সর্বমানবিক। তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে তিনি গ্যেটের উক্তি তুলে ধরেন, "জাতীয় সাহিত্য বর্তমানে অর্থহীন পরিভাষা; এটা বিশ্বসাহিত্যের যুগ এবং প্রত্যেককে অবশ্যই দ্রুত এই অভিমুখী হওয়া উচিত" (শরীফ, ২০০০, পৃ. ৫২৯)। অখণ্ড পৃথিবীর মানুষও অবিভাজ্য। দুনিয়ার মানুষের মননবৈচিত্র্য স্বীকার করেই মানুষ একজাত। সেজন্য আহমদ শরীফ চূড়ান্ত বিবেচনায় মনে করেন যে মানুষের মঙ্গলকামী হলে সাহিত্য আন্তর্জাতিক চেতনা এ যুগের সাধনা হওয়া উচিত।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও মনে করেন যে, সাহিত্য দেশকালের উর্ধ্বে। এতে স্থান-কালের বিরোধ সামান্য (চৌধুরী, ২০০৫, পৃ. ২৪২)। তিনি "মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি" (চৌধুরী, ২০০২, পৃ. ১৩৪) প্রবন্ধে আরও বলেন যে, সাহিত্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণ চিন্তা থেকে বৃহৎ জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দেবে। যতীন সরকারের অভিমতও তা-ই। তিনি কবি নজরুল ইসলামের মত উদ্ধৃত করে বলেন, "যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে তা সব জাতিরই হবে" (সরকার, ২০১৪, পৃ. ৩১)। কিন্তু মার্কসবাদের এই

আন্তর্জাতিকতার অন্তর্গত দর্শনটি কী- তা বোঝার জন্য এক্ষেত্রে বিশ্ববীক্ষার দর্শনটি তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কসীয় সাহিত্যচিন্তায় বিশ্ববীক্ষা ধারণাটি বেশ জটিল। এ সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণের মতভেদও কম নয়। সাধারণভাবে বিশ্ববীক্ষা বলতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বস্তুগত বাস্তবতার বিপরীতে অভিজ্ঞতা এবং ধারণাসমূহের সম্মিলিত প্রকাশকে বোঝায়। এটা এঙ্গেলস কথিত ভ্রান্তচেতনা (false conciousness) বা সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকশ্রেণি বা তাঁদের নির্ধারিত মূলবোধও বোঝায় না। লুসিয়েন গোল্ডম্যানের (১৯১৩-১৯৭০) মতে, বিশ্ববীক্ষা বলতে কিছু সুবিধাভোগী সামাজিক শ্রেণির উন্নত মতাদর্শ বোঝায় (জেফারসন এবং অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ১৯৭, ২১৩)। বস্তুত বিশ্ববীক্ষার তত্ত্ব দ্বারা সাহিত্যেআশ্রিত বিশ্বব্যাপী জীবনাভিজ্ঞতার পূঞ্জিভূত জ্ঞানের নির্যাস বা প্রজ্ঞা বোঝায় যা মানবকল্যাণে বিশ্বসমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত। এককথায় বিশ্ববীক্ষার দর্শনটি ভূয়োদর্শনের অনুরূপ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি জাতীয়তাবাদ সমাজবাদী সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয়। একথায় উত্তর ‘না’। কারণ এতদসত্ত্বেও সাহিত্যে জাতীয়তাবাদকে সমাজবাদীরা অস্বীকার করেননি। আহমদ শরীফ স্বীকার করেন, “সাহিত্যই হচ্ছে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পরিমাপক। কেননা সাহিত্যেই মন-মানসের অন্তরঙ্গ ও সুন্দরতম প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তি ও জাতিকে চেনা যায় তার সাহিত্য পড়েই। এই অর্থেই সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর ও প্রতিভূ” (শরীফ, ২০০০, পৃ. ১২৪)। বাংলাদেশের সাহিত্যে এদেশের মানুষের মনোদৈহিক মুক্তি এবং অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। “আমাদের নাট্যশিল্প ও রবীন্দ্র-ঐতিহ্য” (সরকার, ২০১৪, পৃ. ৭০) প্রবন্ধে যতীন সরকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে সাহিত্যের বীজ সংগ্রহ করে এদেশের ঐতিহ্যভূমিতে সে বীজ বপন করে ফসল ফলাতে হবে। বাংলা সাহিত্যে অনেকে এরূপ ফসলের চাষাবাদ করেন। প্রাবন্ধিক সুবোধ ঘোষ যথার্থই মন্তব্য করেন যে শিল্পের বাঁচা-মরার সঙ্গে জাতির বাঁচা-মরা নির্ভর করে। সুতরাং শিল্পের অভ্যুত্থান সম্ভব হলে জাতির জীবনে অভ্যুত্থান সম্ভব মনে করা অসঙ্গত নয় (ঘোষ, ২০২০, পৃ. ২৩)।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট — তিনজন প্রাবন্ধিকই মনে করেন যে, সাহিত্য একই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতা ধারণ করে। এর বহিরাঙ্গ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং চেতনাটি আন্তর্জাতিক। সাহিত্যের লক্ষ্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল। তাঁদের এ অভিমত অকপটে স্বীকার করা চলে। কেবল বিষয়টি স্পষ্ট করতে বলা যায়, সাহিত্য জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতবাদের সমন্বয়ে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবটি একটি আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রস্তাবে ‘সর্বপ্রযত্নে’ (চীন) দেশে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালানোর উপর আলোকসম্পাত করে বলা হয় — দেশি-বিদেশি অতীত সংস্কৃতির মূল্যবান অংশকে বরণ করে এবং আত্মস্থ করার অঙ্গীকার নিয়ে, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক জাতীয়

সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৬১-৪)। স্পষ্টতই চীনা, রুশ সাহিত্যসহ সকল দেশের সমাজবাদী সাহিত্য নিজ দৈশিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের কলেবরে আন্তর্জাতিকতাবাদ ধারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজবাদী সাহিত্য দৈশিক আবহ নিয়ে আন্তর্জাতিকতা লালন করে (ঘোষ, ২০২০, পৃ. ২৯)। বস্তুত সমাজের সামাজিক বুনিয়াদের মতো শিল্পের সামাজিক বুনিয়াদ আবশ্যক। অন্যথায় বাস্তববাদী সাহিত্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সাহিত্যের বাহ্যিক রূপে দেশীয় অবয়ব এবং অন্তর্গত ভাববস্তু হবে আন্তর্জাতিক। এভাবে সাহিত্য জাতীয় চেতনাকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক চেতনাকে বরণ করবে।

## উপসংহার

স্পষ্টতই সাহিত্যনির্মাণতাত্ত্বিক ধারণায় বুর্জোয়া মত থেকে সমাজবাদী মত ভিন্ন। এজন্য শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাজবাদী সাহিত্যিকের মার্কসীয় মতবাদ ও শিল্পসম্পর্কিত ধ্যানধারণা থাকা আবশ্যক। মার্কসবাদ একটি জীবনদর্শন। একে আদর্শরূপে গ্রহণ করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এটা মার্কসবাদী সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে শিল্পকর্মে প্রভাব ফেলে এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এর প্রকাশ ঘটে। মার্কসীয় নির্মাণতত্ত্ব মীমাংসিত কোনো বিষয় নয়। সকল সমাজবাদী তাত্ত্বিক ও মার্কসঅনুসারী সব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেননি। উপরন্তু সমাজবাদী সাহিত্যচিন্তা একটি প্রগতিশীল মতবাদ। এটা ব্যক্তি, সময়, পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতির সঙ্গে বিবর্তিত হয়। মার্কসবাদী সাহিত্যিককে বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রতিনিয়ত পথ-পদ্ধতি ও কর্মকৌশল প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। একই সঙ্গে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সমাজবাদী শিল্পের মূল লক্ষ্য-আদর্শচ্যুত না হয় — এব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়। সমাজবাদী শিল্পে নন্দনভাবনা ও ভাবাদর্শের সুষম সমন্বয়ের পাশাপাশি পথ ও পাথেয়র সুসংহতি ও তত্ত্বের উপযোগিতা বিধান করা জরুরি। সমাজবাদী সাহিত্যের আদর্শ-উদ্দেশ্য-শৈলী প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু মত-পথের ভিন্নতা থাকলে আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও যতীন সরকার সমাজবাদী ও মার্কসঅনুসারী। সাহিত্যের গঠন-প্রকৃতি নিয়ে উদারনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে আহমদ শরীফ বুর্জোয়া ও সমাজবাদ মিশ্রিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সাহিত্যে ট্রটস্কির মতের অনুসারী (শরীফ, ২০১৬, পৃ. ১৬৭)। এ ব্যাপারে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মধ্যপন্থী সমাজবাদী (ইসলাম, সাহিত্যিকী, ১৪১০-১১, পৃ. ২৪৭)। এঁদের তুলনায় যতীন সরকার সাহিত্যতাত্ত্বিক ভাবনায় অধিকতর মার্কসবাদী চেতনাশ্রয়ী। তিনি সাহিত্যদর্শনে লেনিনের ধারণার অনুগামী (সরকার, ২০১১, পৃ. ১৫২-৮)। তিনজন তাত্ত্বিক সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সমতা, মানবিক চেতনা, সামাজিক বাস্তবতা, সমস্যার চিত্রণ, সমাধান এবং সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলার ওপর আলোকসম্পাত (ফোকাস) করেন। তাঁরা শিল্পকলায় নিহিত সময়সচেতন থেকে এবং বিবর্তনশীল সময়ের মাত্রার প্রতি লক্ষ রেখে সৃজনশীল শিল্পকে বারবার শিল্পপ্রযুক্তি ও শিল্পবিধি বিনির্মাণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ

করেন। তাঁদের এই তত্ত্বচিন্তা প্রধানত বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে আবর্তিত হলেও নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যের জন্য তা সমভাবে প্রযোজ্য।

## গ্রন্থপঞ্জি

### প্রাথমিক উৎস


চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম । (২০০২)। *প্রবন্ধ সমগ্র ১*। ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ।

চৌধুরী, সি. ই.। (২০০৪)। *প্রবন্ধ সমগ্র ২*। ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ।

চৌধুরী, সি. ই.। (২০০৫)। *প্রবন্ধ সমগ্র ৩*। ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ।

চৌধুরী, সি. ই.। (২০০৬)। *প্রবন্ধ সমগ্র ৪*। ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ।

চৌধুরী, সি. ই.। (২০১২)। *প্রবন্ধ সমগ্র* ৬। ঢাকা: বিদ্যা প্রকাশ।

শরীফ, আহমদ। (২০০০)। আহমদ কবির সম্পা.। *আহমদ শরীফ রচনাবলী ১*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

শরীফ, আ.। (২০০৬)। সম্পা.। *আহমদ শরীফ রচনাবলী* ২। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

শরীফ, আ.। (২০১০) সম্পা.। *আহমদ শরীফ রচনাবলী* ৩। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

শরীফ, আ। (২০১৪)। পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা সম্পা.। *আহমদ শরীফ রচনাবলী* ৭। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

শরীফ, আ.। (২০১৬)। সম্পা.। *আহমদ শরীফ রচনাবলী ১০*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সরকার, যতীন। (২০১১)। *যতীন সরকার রচনাসমগ্র ১*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

সরকার, য.। (ক২০১১)। *যতীন সরকার রচনাসমগ্র* ২। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

সরকার, য.। (২০১২)। *যতীন সরকার রচনাসমগ্র* ৩। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

সরকার, য.। (২০১৪)। *যতীন সরকার রচনাসমগ্র ৫*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

সরকার, য.। (২০১৮)। *যতীন সরকার রচনাসমগ্র* ৬। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।


### দ্বৈতয়িক উৎস


আলী, কাজী জুলফিকার। (২০১২)। *সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধ : সমাজ ও সংস্কৃতিচিন্তা।* এম ফিল অভিসন্দর্ভ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আহসান, নিলুফা। (২০১৯)। *বাংলাদেশের প্রবন্ধে সাহিত্যচিন্তা*। পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আচার্য, শ্রীসরোজ। (২০২০)। এম. মতিউর রহমান সম্পা.। *সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব*। ঢাকা: অবসর।

ওদুদ, কা, আ.। (২০১৯)। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পা.। *শিখাসমগ্র*, ১ম বর্ষ।

খাতুন, মোছা. আমিনা। (২০১৮)। *যতীন সরকারের প্রবন্ধ : সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য।* পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ । জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

গুহ, উর্মিলা (প্রকৃত নাম প্রকাশ রায়)। (১৯৭৫)। ধনঞ্জয় দাশ সম্পা.। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*। কলকাতা: প্রাইমা পাবলিকেশনস।

ঘোষ, শ্রীসুবোধ। (২০২০)। সম্পা.। *সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব.*। ঢাকা: অবসর।

চক্রবর্তী, শ্রীসতীন্দ্র। (২০২০)। সম্পা.। *সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব*। ঢাকা: অবসর।

জেফারসন, অ্যান প্রমুখ (অনুবাদ আফজালুল বাসার)। (১৯৯১)। *বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব.*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

দাশ, ধনঞ্জয়। (১৯৭৫)। ধনঞ্জয় দাশ সম্পা.। "ভূমিকা"। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*। কলকাতা: প্রাইমা পাবলিকেশনস।

নন্দী, সুধীর কুমার। (২০১৪)। সম্পা.। *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব* । ঢাকা: অবসর।

নায়ক, প্রণব কুমার। (২০১৪)। প্রদীপ কুমার নন্দী সম্পা.। *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*। ঢাকা: অবসর।

পাল, রবিন। (২০১৪)। সম্পা.। *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*। ঢাকা: অবসর।

প্রধান, শ্রীসুধী। (২০২২)। এম মতিউর রহমান সম্পা.। *মার্কসীয় দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, ৩য় খণ্ড। ঢাকা : অবসর।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। (১৯৭৬)। ধনঞ্জয় দাশ সম্পা.। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* ২। কলকাতা: নতুন পরিবেশ প্রকাশনী।

বুজুয়েভ ও গারোদনভ (অনুবাদক- ননী ভৌমিক)। (১৯৮৮) *মার্কসবাদ- লেনিনবাদ* (*What is is Markism-Leninism?*)। মস্কো : প্রগতি প্রকাশ।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। (২০০৭)। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। (২০১৮, সং ৫ম)। *সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ.*। কলকাতা দে'জ পাবলিশিং।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলকুমার। (২০২০)। সম্পা.। *সৌন্দয, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব*। ঢাকা: অবসর।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থপ্রতিম। (২০২০)। সম্পা.। *সৌন্দর্য, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব*। ঢাকা: অবসর।

রায়, অনিমেষ। (১৯৭৬)। সম্পা.। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* ২। কলকাতা: নতুন পরিবেশ প্রকাশনী।

রায়, নীরেন্দ্রনাথ। (১৯৭৬)। সম্পা.। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* ২। কলকাতা: নতুন পরিবেশ প্রকাশনী।

রায়, প্রকাশ। (১৯৭৫)। সম্পা.। *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*। কলকাতা: প্রাইমা পাবলিকেশনস।

রহমান, সাঈদ-উর। (১৯৮৬)। সংকলন ও অনুবাদ। *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা*। ঢাকা : বাঙ্গালা গবেষণা।

রহমান, হাসান হাফিজুর। (২০০০)। *আধুনিক কবি ও কবিতা*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

হোসেন, খোন্দকার আশরাফ। (২০১৪)। সংকলন ও সম্পা.। "মার্কসীয় নন্দন ও সাহিত্যতত্ত্ব", *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনাতত্ত্ব*। ঢাকা : অবসর।

**পত্রিকা**

আকাশ, এম. এম.। (২০০৬)। সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পা.)। *উলুখাগড়া* । ১ম বর্ষ, ৩য় স.। ঢাকা : ইত্যাদি প্রিন্টার্স।

ইসলাম, শেখ রজিকুল। (চৈত্র, ১৪১০-১৪১১)। মুহম্মদ আবদুল জলিল (সম্পা.)। *সাহিত্যিকী*। ৩৬-৩৭ স.। রাজশাহী : উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস।

হোসেন, মো. শওকত। (জুন, ২০২০)। নাহিদা হক সম্পা.। *ভাষা-সাহিত্যপত্র*। বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৬তম স.। ঢাকা: আনিকা প্রিন্টিং প্রেস।

**ইংরেজি বই**

Brezhniv, L. I. (1982). *Socialism, Democracy and Human Rights* (Vol.26). Moscow : Pergamon Press.

Marx, K. & Eangels, F. (1976). *The German Ideology (Third Revised Edition)*. Moscow: Progress Publishers.

Marx, K. (1977). *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers

Lenin, V. (2010 Digital reprint). Collected Works (Vol. X). Moskow : Progress Publisher.

Engels, F. (Letters:Marx-Engels correspondence 1888. (n.d.). Retrieved May 23, 2025, from https://www.marxists.org/archive/marx/works/1888/letters/88_04_15.htm#:~:text=Realism%2C%20to%20my%20mind%2C%20implies%2C%20besides%20truth%20of,make%20them%20act%2C%20are%20not%20perhaps%20equally%20so.)